সিকি শতাব্দী পেরিয়ে

শৌভিক চক্রবর্তী

শৈশব থেকেই দেখে এসেছি, কাগজওয়ালা বাড়িতে দিয়ে যেত সাপ্তাহিক দেশ। আর তার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন আমার মা। দাম যতদূর মনে পড়ে পঁচিশ পয়সা। তখন সৈয়দ মুজতবা আলির দেশ বিদেশ, পঞ্চতন্ত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কুবেরের বিষয় আসয় ধারাবাহিক ভাবে বেত দেশ পত্রিকায়। আর ছিলো নিয়মিত বিভাগ, সুনন্দর জার্নাল সংগে চণ্ডী লা হিড়ীর অনন্য কার্টুন, সনাতন পাঠকের সাহিত্য সংবাদ, রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য, ঘরে বাইরে, ট্রামে বাসে, গানের আসর ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবার বই পত্র পড়ার সময় ছিলো না, তাই রাতে খাবার পর মা পড়ে শোনাতেন সেইসব ধারাবাহিক। ঘুমন্ত দাদার পাশে শুয়ে আমি চোখ বুঁজে চুপ করে শুনতাম সেইসব বড়দের উপন্যাস। পুজোর সময় আসতো উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, নবকল্লোল ইত্যাদি শারদীয়া সংখ্যাগুলি। তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, কালকুট, সুবোধ ঘোষের মতো লেখকদের টাটকা উপন্যাস আর গল্পে ঠাসা সেইসব পত্রিকা থাকতো আমার নাগালের বাইরে। আমাদের জন্য আসতো শুকতারা, শিশুসাথী এই সব বার্ষিকীগুলি। পুজোর দিনগুলির সংগে মাখামাখি হ'য়ে থাকতো সেইসব লেখা আর ছবি। এর কিছুদিন পরে দেশ পত্রিকার নব পর্যায়ে আরো অনেক বিভাগের সংগে যখন যুক্ত হ'লো লী ফকও সীমুর ব্যারির অরণ্যদেব (ছবি ও গল্পের ধারাবাহিক), সে সময় থেকেই দেশ পত্রিকা হাতে পাওয়ার শু বলা যায়। তখন সম্ভবত নরেন্দ্রন াথ মিত্রের পিছে ফিরে দেখা, প্রতিভা বসুর আলো আমার আলো, সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একা এবং কয়েকজন নিয়মিত বেচেছ, আর একটু ক'রে আমিও যেন দেশ পত্রিকার কবিতা, পুস্তক আলোচনার মতো দুরূহ রচনাদির অবোধ পাঠকে রূপান্তরিত হ'তে লাগলাম। আর খুটিয়ে পড়তাম বইয়ের বিজ্ঞ াপন। খুব মনে আছে অধুনাবিস্মৃত কবি দ্রেন্দু সরকারের কবিতার বইয়ের নাম ছিলো আলেকজাণ্ডার বিক্রি করে দাঁতন ম াজন। খুবই অবাক হয়েছিলাম। ইতিহাস বইয়ের বীর সম্রাট কেনই বা দাঁতের মাজন বিক্রি করবে এমন অনেক ভাবনার শেষে স্থির করি, কবিতায় অসম্ভব বলে কিছু নেই।

স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা লিখলেও তার আগে থেকেই পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা শু করে দিয়েছি। বর্ণালী নাম দিয়ে সেই দেয়াল পত্রিকায় অন্তমিলের ছড়া, ছবি ও টুকরো ঘটনা লিখে টাঙালাম প্রতি মাসে। চেনা অচেনা অনেক মানুষই তা দাঁড়িয়ে পড়তেন। তাতে আমরা খুব উৎসাহ বোধ করতাম।

একদিন বীরেনদা এসে বললেন, সময় ক'রে আমার বাড়িতে এসো, পরের সংখ্যা আরো ভালো ক'রে ছবি এঁকে সাজিয়ে দেবো। বীরেনদা অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তখন সব পেয়েছির আসরে সঙঘমিত্র। তাছাড়া নাটক ইত্যাদির সংগেও যুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন আমায় নিয়ে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই স্কুলের বয়সেই। আলাপ করিয়ে দিলেন তণ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তণদা আমাদের জন্য একটি কবিতা লিখে দিলেন। দেখি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দে অন্য শব্দ বসিয়ে অতি সুন্দর একটি কবিতা। আজও কিছু কিছু মনে আছে। কবিতাটি ছিলো এরকম —

তবে শোন
তিন বোন
হীরে চুনী পান্না,

দিন রাত
শুধু কাজ
এক সুরে কান্না।
ডাক্তার
এসেছিলো
তাহাদের বাড়িতে
চোখ বুজে
বলেছিলো
রোগ আছে নাড়িতে।
ডাক্তার দিয়ে গেলো
বহুতর পথ্যি,
একদিন
পরে রোগ
সেরে গেলো সত্যি।

এভাবে দিনে দিনে পরিচিত হচ্ছিলাম নতুন নতুন লেখক কবিদের সংগে। নতুন কিছু লিখলেই বীরেনদাকে গিয়ে দেখাত াম। তিনি কিছু কিছু সংশোধনও ক'রে দিতেন। সব সময় যে খুশি হতাম তা নয়, অভিমানও হ'ত খুব। বীরেনদা শোনাতেন তার নিজের লেখা। সেইসব কবিতা ছিলো মুক্তছন্দে, কখনও বা আত্মগত উচচারণ অথবা সংলাপ রচনার মতো। বীরেনদা কথাবার্তা বলতেন খুব নিচু স্বরে, ধীরে ধীরে আবৃত্তি করার মতো; কথার মাঝে মাঝে 'কেমন' শব্দটি ছিলো তার অন্যতম মুদ্রাদোষ। রূপবান এই মানুষটি বেশিদিন আমাদের কাছে থাকলেন না, ব্রেন টিউমার অপারেশনের সময় আচমকা চলে গেলেন।

আমার গৃহশিক্ষক অসীম চক্রবর্তীও অনুক্ত, সত্তর দশক এইসব পত্রিকায় গল্প কবিতা লিখতেন। এক রবিবার সকালে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অসীমদা খুলে দেখালেন রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, দেখলাম অসীমদার গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বললেন, তোর এক কাপ চা পাওনা হ'লো। পরবর্তীকালে সেইসব গল্পের একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিলো। নাম দিয়েছিলেন, মৌলিক স্বপ্নের উদ্যান। এছাড়া এডোয়ার্ড ইসমাইল ছদ্মনামেও লিখেছেন বহু কবিতা। অসীমদার খুড়তুতো ভাই তপনদ াও কবিতা লিখতেন। তিনি এখন লোকলৌকিক নামে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

হায়ার সেকেন্ডারীর আগেই বর্ণালী বন্ধ হ'য়ে গেলো। পরে সেই হাতে লেখা পত্রিকার বিশেষ বিশেষ লেখাগুলি নিয়ে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিতও হয়েছিলো। কলেজ পড়ার সময়ে বেদব্যাস পত্রিকার কথা আগেই লিখেছি। তখন চেনাজানার চৌহদ্দিও বেড়েছে কয়েকগুণ। দেবানন্দ দে, শংকর ব্রহ্ম, সুভাষ দেবনাথ, প্রবীর রায় এরা সকলেই ছিলেন বেদব্যাসের স ম্পাদকমণ্ডলীতে। এছাড়া ঢাকুরিয়া থেকে আমাদের দৈনিক আড্ডায় চলে আসতেন সুনির্মল ঘোষ, কেয়াতলা লেন থেকে অভীক রায় সহ আরো অনেকেই। দল বেঁধে আড্ডা দিতাম সকলে। চলাফেরাও করতাম একসঙ্গে। মনে আছে রথতলার কাছে থাকতেন গল্পকার মানস দাশগুপ্ত। রবিবার বিকেলে শোনাতেন তার নতুন লেখা গল্প। শশ্রুধারী সেই সুলেখক এখন লেখালেখি ছেড়ে শুনেছি হয়েছেন হস্তরেখাবিদ। কবি শংকর আচার্যের কথাও মনে পড়ে। মিনিবাস চালানোর পাশ াপাশি অবসরপ্রাপ্ত এই সৈনিক লিখতেন বিদ্রোহী কবিতা। স্টিয়ারিং হাতে রেখেও বলে যেতেন সেইসব কবিতার অংশ। সেই নাকতলা-বিবাদী বাগ মিনিবাসে বসেই একদিন কবিতা শোনালেন কবি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই সপ্তাহেই কলকাতার কড়চায় শংকরদাকে নিয়ে বেল ছোট্ট কড়চা, মিনি কবি।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মজুমদার তখন আপরেম নামে একটি আবৃত্তির সংস্থা চালাচ্ছেন। সভাপতি প্রদীপ ঘোষ। এছাড়া দীপঙ্করদ া তখন নাট্যসমালোচক নাম দিয়ে দেশ পত্রিকায় নাটকের আলোচনাও লিখতেন। মনে আছে একবার হলে গিয়েছিলাম 'কবি' নাটকের কমপ্লিমেন্টারী কার্ড সংগে নিয়ে । দীপঙ্করদা একটি ছোট্ট রাইটিং প্যাড আর পেনসিল টর্চ হাতে দিয়ে আম ায় বলেছিলেন, আমার যেতে একটু দেরী হবে, তুই গিয়ে প্রথম দিকটা কভার করিস। আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। সবিত

াব্রত দত্ত, কেতকি দত্তের দাপটের সঙ্গে মঞ্চ শাসন আর দরাজ গলার গান আমার বহুদিন মনে থাকবে। দীপঙ্করদার সেই সংস্থা আপরেমের এবার পঁচিশ বছর পূর্ণ হ'লো।

দীপঙ্করদার বাড়িতেই আলাপ হ'লো ওর বোন সুমিত্রার সঙ্গে। সুমিত্রা আমার সমবয়সী এবং যখন জানলাম ও নিজেও কবিতা লেখে, তখন বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগলো না। সুমিত্রা প্রায়দিনই চলে আসতো আমার কলেজে। ক্যান্টিন বসে শোনাতো ওর কবিতা। ওর আবৃত্তি গলাও ছিলো বেশ আকর্ষণীয়। বেদব্যাসেও নিয়মিত লিখতো। একদিন বিকেলে আম ার বাড়িতে এসে সুমিত্রা জানালো ও নিজে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চায়। নাম দিয়েছে সাময়িকী। প্রচ্ছদ আঁকার জন্য কার কাছে যাবে বুঝতে পারছিলো না। আমি বললাম, চল তাহলে কমলদার বাড়িতে। কমল সাহা তখন নামী অনামী নান া পত্র পত্রিকা, কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকছেন। তাকে প্রস্তাব দিতে তিনি সংগে সংগে রাজী হ'য়ে গেলেন। কিন্তু পত্রিকার নামে সংযোজন ঘটলো। কমলদা আর সুমিত্রা দু'জনে মিলে বার করলো দরোজা সাময়িকী পত্রিকা। দু'টো সংখ্যার পর আর সে কাগজ বেরোয়নি। সুমিত্রা এখন দৈনিক আজকাল পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে। দেখা প্রায় হয়ই না, হলেও কবিতা শোনা আর হয় না।

সে সময় আমাদের পরিচিতদের মধ্যে স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও আবৃত্তি করতেন। এছাড়া আকাশবাণীতে পরিচালনা গল্প দাদুর আসর। স্মৃতিময়দা এখন কোথায়, কি করছেন জানিনা, তবে সে সময়ে পাড়ার অনুষ্ঠিত জলসায় ঘোষক হিসেবে ত ার ছিলো বিপুল খ্যাতি।

তখন কবি সম্মেলন বা কবিতা পাঠের আসর হ'তো খুব ঘন ঘন। আর বেদব্যাসের সুখ্যাতির সুবাদে অন্যদের সংগে আম ারও ডাক পড়তো বিভিন্ন জায়গায়। শংকর দাশগুপ্ত তখন জন্মদিন নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, আর প্রায়শই ত ার যোধপুর পার্কের বাড়ির ছাদে বসতো কবিতার আসর। কখনও ফণিভূষণ আচার্যের মহারাজ সন্ধ্যায় ডাক পড়তো অ ামাদের। নাকতলার শক্তি সংঘেরও বেশ কয়েকবার কবিতার আসরে কবিতা পাঠ করেছি।

রবিবার সকালে দেশপ্রিয় পার্ক বাসস্টপের কাছে সুতৃপ্তি রেস্তোরায় বসতো সাহিত্যের আড্ডা। সেখানে দক্ষিণ কলকাত ার প্রায় সব কবি সাহিত্যিকরাই নিয়মিত আসতেন। সূদুর কাকদ্বীপ থেকেও প্রায়শ চলে আসতেন কবি সামসুল হক। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, কেদার ভাদুড়ী, সমরেন্দ্র দাস, গৌতম চৌধুরী আরো অনেকের মুখ মনে পড়ে। এক এক সময় আড্ডা সুতৃপ্তির সামনে চায়ের দোকান অবধি বিস্তৃত হ'য়ে যেতো।

২২বি প্রতাপাদিত্য রোডের কবিপত্র ভবনেও বসতো সাহিত্যের আড্ডা। পবিত্রদার ইবলিসের আত্মদর্শন নামে দীর্ঘ কবিত াটি তখন সকলের মুখে মুখে। শৈবাল মিত্র, প্রভাত চৌধুরী, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, অসীম চক্রবর্তী, শচীন দাস, স্বপন সেন, চণ্ডী মন্ডল প্রমুখ ছিলেন আড্ডাধারীদের অন্যতম। এই সময়েই সন্তোষপুর ঘোষের সংগে বিরোধের কারণে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজারের সংশ্রব ত্যাগ করে যুক্ত হন যুগান্তর পত্রিকার সংগে। সাপ্তা হিক অমৃত পত্রিকার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। যুগান্তরের দপ্তর তখন ছিলো বাগবাজারের কাছেই। শ্যামলদার সূত্রেই কবিপত্রের লেখক কবিরাও অমৃত পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শু করেন। সে সময় অমৃতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার গল্পকারদের পরিচিতি সমেত অনুবাদ ছাপা হ'তো, খুব মনে আছে।

সেইসময় শ্যামলদা এই প্রিয় শিল্প পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কলকাতা, লিটল ম্যাগাজিন ও দুর্গোৎসব' শীর্ষক অনবদ্য রচনাটি অমৃতে পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন।

রাসবিহারীর রমাপতিবাবুর বইয়ের দোকানের পাশে অধুনালিপ্ত অমৃতায়ণ রেস্তোঁরাতেও হ'তো সাহিত্যের আড্ডা। অ ার গড়িয়াহাট মোড়ে ইউ বি আই-এর পাশে ছিলো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান শংকর বুক স্টল। পশ্চি মবঙ্গের প্রায় সমস্ত পত্র পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় সাজানো যে স্টল ছিলো আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। দাঁ ড়িয়ে দাঁড়িয়ে উল্টেপাল্টে পত্রিকা পড়া ছিলো আমাদের অন্যতম নেশা। শাস্ত্রবিরোধী, হাংরি, শ্রুতি ইত্যাদি ছাড়াও নানা ভাবনার পত্রপত্রিকা আর কবিতার বই থাকতো সেই স্টলে। বুক স্টলের শংকরদা সাহিত্যজগতের নানা টুকিটাকি খবর র াখতেন। তার কাছেই প্রথম জানতে পারি প্রবাসী কবি ও অধ্যাপক ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মহত্যার সংবাদ। ধূর্জটিদার একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিলো জীবিতকালেই। তার নাম, কেন জলশব্দে প্ররোচিত হ'লে মালবিকা। তখন মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদনা করতেন এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সারা বছরের লিট্‌ল ম্যাগাজিন থেকে বাছাই কবিতার সেই সংকলন

খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো।
এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি নিজে বাঘাযতীনে খুলেছিলাম লিট্‌ল ম্যাগ কাউন্টার। সাগরিকা হোটেলের পাশে বন্ধ দোকানের সামনে সেই স্টলের নাম দিয়েছিলাম, শুধু কবিতার জন্য। পরিচিত সম্পাদকদের কাছ থেকে নিয়ে আসতাম সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলি। শুধুমাত্র বিকেলেই আড্ডা দেবার পাশাপাশি চালাতাম স্টলটি। লিট্‌ল ম্যাগের পাশেই থাকতো ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ফ্রন্টিয়ার ইত্যাদি পত্রিকাও কখনও কলেজ স্ট্রীটের পাতিরাম থেকে বইপত্র এনেও স্টল সাজিয়েছি।
এই সময় বেদব্যাস বন্ধ হ'য়ে যায়। আমার স্কুলের বন্ধু বিপ্লব সিংহকে সাথে নিয়ে যৌথ সম্পাদনায় শু করলাম প্রতিশব্দ পত্রিকা। সে সময়েই আলাপ হয় প্রদীপ খাস্তগীরের সংগে। প্রদীপ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু সদ্য স্বাধীন সে দেশে তার নামে বহাল ওয়ারেন্টের কারণে কলকাতায় দিদির বাড়িতে অলস দিনযাপন করছে। সাংবাদিক, কবি প্রদীপের সংগে আলাপ জমে উঠলো খুব সহজেই। মনে আছে প্রদীপ প্রতিশব্দে প্রকাশিত ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা বঙ্কিম মাহাতোর একটি কবিতার খুব প্রশংসা করেছিলো। কি আশ্চর্য, দপ্তরে আসা চিঠিপত্রে সকলেই ওই লেখাটির উল্লেখ করেছিলো। বঙ্কিমবাবুকে কোনদিন দেখিনি, ডাকে আসা কবিতা থেকে বাছাই করে পত্রিকা বার করতাম। আজ এত বছর পর জানিনা বঙ্কিমবাবু কোথায় আছেন, বা আদৌ কবিতা লিখছেন কিনা, তবু আজও তার কবিতার কথা আমি ভুলতে পারিনি।
খুব আত্মগত ধরনে কবিতা পাঠ করতো প্রদীপ। ওর একটি প্রিয় কবিতা এখনও আমার মনে আছে। স্মৃতি থেকে সেই কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

চোখে বড় জ্বালারে দোস্ত
এ শালার রাত যেন দিন
তেইশ রেঙ্কিনে গিয়ে শুধোলেম
তোর ওই অনন্ত পকেটে
যদি থেকে থাকে আট আনার ঘুম
দে না ইয়ার বহুত মিনতি তোর পায়ে

এখন দেখে যাও হে রৌদ্রতাপিত কমরেড
এখন দেখে যাও হে শুদ্ধতম কবি
আমার রক্তবমনের ভিতর
কোনও পাপবিদ্ধ গণিকা কি
রেখে গেছে আপন আত্মজের গোপন ইস্তাহার
কিছুই কি রাখেনি আমার যুগল কর্ণিয়ায়
পৃথিবীর সাত রঙা লণ্ঠন
কিংবা শ্যামল রঙ রমণীর আলো?

পরবাসে থাকা ঐ কবির ব্যাথিত হৃদয় বোধ হয় আমাকেও প্রভাবিত করেছিলো। চট্টগ্রামে স্পার্ক জেনারেশন আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলো প্রদীপ। স্বপন দত্ত, খালিদ আহসান, শিশির দত্ত এমন অনেক বন্ধুদের কথা ও বলতো। প্রতিশব্দের জন্য চটজলদি কোনও প্রতিবেদন কিংবা কবিতার আলোচনা অনায়াস দক্ষতায় চায়ের দোকানে বসেই লিখে ফেলতে পারতো। এ সময়েই একদিন খবর পেলাম কবি যোগব্রত চক্রবর্তী আর নেই। বাড়ি ফেরার পথে হাঁটুজলেই অচৈতন্য হয়ে মারা যান যোগব্রতদা। পঁচিশে বৈশাখের কবিতা সম্পাদনার সুবাদে খুবই জনপ্রিয় যোগদা কবি মাত্রই সকলকে তার আত্মার আত্মীয় বলে মানতেন। কবিপক্ষের প্রতিশব্দের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের শিরোনামে প্রদীপ লিখলো, বৈশাখী ধূলিঝড় উড়িয়ে আর আসবেন না যোগব্রতদা।
কথাকার কণা বসুমিশ্র সে সময়ে থাকতেন সেন্ট্রাল পার্কের এক ফ্ল্যাটে। তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের স্টলে; নানা ধরনের বইপত্রের অর্ডার দিতেন, সংগ্রহ করতেন স্টল থেকে। গল্পগুজব করতেও খুব ভালবাসতেন।
কবি কেদার ভাদুড়ী তখন ইংরেজী কবিতাপত্র ও সময়ানুগ সম্পাদনা ছেড়ে ব্যাতিরেক নামে একটি মাসিক কাগজ শু

করেন। সহযোগী হিসেবে সংগে ছিলো তার দুই প্রিয় ছাত্র, শুভানন রায় ও বিপ্রতীপ গুহ। প্রতি সংখ্যায় থাকতো একজন কবির পরিচিতি সহ গুচ্ছ কবিতা আর সেই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য গিফ্‌ট চেক পুরস্কার। অন্য অনেকের সংগে একবার আমিও সম্মানিত হয়েছিলাম সেই পত্রিকা থেকে। নাকতলা হাই স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক কেদারদার বাড়িতে যখন তখন হাজির হতাম। হিটারের জল গরম ক'রে তৈরী হ'তো র-চা আর কেদারদার প্যাকেট থেকে একটার পর একটা চারমিনার। কেদারদা পরপর শুনিয়ে যেতেন তার নতুন কবিতা; কী অবলীলায় না লিখে ফেলতেন এক একটি সনেট। সে সময়েই আমরা জেনেছিলাম তার পাঁচ হাজার অপ্রকাশিত সনেটের কথা। তার কবিতার বইয়ের বিজ্ঞাপন নিজেই নিজের নামের আগে জুড়ে দিতেন দুর্ধর্ষ অথবা দ্য গ্রেট বিশেষণ, যা খুবই মানানসই মনে হ'তো।

সৈনিকের ডায়েরী নামে একটি মিনি পত্রিকা মাসিক হিসেবে প্রকাশ করতেন, অভিজিৎ ঘোষ ও নির্মল বসাক। স্বল্প দৈর্ঘ্যের কবিতা ছাড়াও সেখানে ছাপা হ'তো শিল্প-সাহিত্যের নানা টুকরো খবর। একবার অভিজিৎদার সংগে দলবেঁধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি পৌষমেলার সময়। সত্যরঞ্জন ঝিাসের কণ্ঠস্বর পত্রিকার স্টল হয়েছে। কণ্ঠস্বরের উদ্যোগেই বুক করা হয়েছে কলাভবনের দুটো পাশাপাশি ঘর। একটি পুষদের জন্য অন্যটি মহিলাদের। তাদের মধ্যে আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন কিছুক্ষণ পত্রিকার সম্পাদিকা জয়া রায়; আর সেখানেই পরিচিত হই বড়িষার শুক্লা মজুমদার এর সংগে। স্নেহময়ী শুক্লাদির সংগে পরবর্তীকালে বহুবার দেখা হয়েছে কখনও আর্ট ফেয়ার, বইমেলা কিংবা পথনাটকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। মুক্তমনা মানুষটির অনেক আন্তরিক পোষ্টকার্ড এখনও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। মনে আছে প্রভাতী অনুষ্ঠানে যাবার প্রস্তুতি নিতে কেউ একজন অন্ধকার ভোরে উঠে তার টুথব্রাশে পেস্ট নেবার বদলে বোরোলীন নিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর থু-থু, সারা সকাল ভন্ডুল।

শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশের নিচে গাছগাছালির সাহচর্যে সেই সংগীতানুষ্ঠানের প্রবেশ পথে চন্দনবাটি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো পাঠরতা ছাত্রীরা। কেউ ভিতরে ঢুকলেই তার কপালে এঁকে দিচ্ছিলো চন্দন ফোঁটা। সেই জাদুস্পর্শেই কিনা জানিনা সেই সাংগীতিক সক ালে এক অবর্ণনীয় আবেশ এনে দিতে পেরেছিলো। দুপুরে ইন্টারন্যাশানাল ক্যান্টিনে আহার আর বিকেল থেকে কালোদার চায়ের দোকানের জবরদস্ত আড্ডা। অন্যদিকে কণ্ঠস্বর স্টলে লাগাতার কবিতাপাঠ। মঞ্চে ছৌ-নাচ আর বাউল গানের অনুষঙ্গ, সব মিলিয়ে সেবারের পৌষমেলা আমার স্মৃতিসঙ্গী থাকবে চিরদিন। এরপর বিভিন্ন সময়ে, পৌষমেলা, বসন্তোৎসব, বাইশে শ্রাবণ ছাড়াও বহুবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। কিন্তু প্রথম দেখা শান্তিনিকেতনে কোনদিন ম্লান হবার নয়। রামকিঙ্কর চিরনতূন সুজাতা, সাঁওতাল পরিবার, গান্ধী মূর্তি'র সেই ভাস্কর্যগুলির মতই তা আমার কাছে ভাস্বর হয়ে আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com